৫.১৬. অনুমান (Inference)

'অনুমান' কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'পশ্চাৎ-জ্ঞান', অর্থাৎ যে জ্ঞান অপর কোন জ্ঞানের পরে হয় ('অনু' অর্থে পশ্চাৎ, 'মান' অর্থে জ্ঞান)। 'অনুমান' বলতে আমরা সাধারণত যথার্থ জ্ঞানকে বুঝি। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে 'অনুমান' শব্দটিকে 'প্রমা' বা 'যথার্থ জ্ঞান' অর্থে প্রয়োগ করা হয়নি। ভারতীয় দর্শনে 'অনুমান' বলতে বোঝায় 'প্রমাণ' অর্থাৎ যথার্থ **জ্ঞান লাভের পদ্ধতি**। এই পদ্ধতির মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানকে বলা হয় **'অনুমিতি'**। অনুমিতি প্রত্যক্ষ অনুভব নয়, পরোক্ষ অনুভব।

অনুমান একপ্রকার মানসিক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে জ্ঞাত বিষয়ের ওপর নির্ভর করে অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। কোন এক বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই—এমন এক বিষয়ের জ্ঞানলাভের প্রণালী হল অনুমান। দূর থেকে রান্নঘরে ধূম দেখে আমরা বলি যে, রান্নাঘরে বহ্নি আছে। এখানে বহ্নি প্রত্যক্ষ করা হয়নি, অনুমান করা হয়েছে।

এই অনুমান দুটি পূর্বজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। যথা— (১) রান্নাঘরে ধূমের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষজ্ঞান ও (২) 'যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি'—এমন পূর্বার্জিত জ্ঞান। এ-দুটি পূর্বজ্ঞানের ওপর নির্ভর করেই রান্নাঘরে বহ্নির অনুমান করা সম্ভব। প্রথম পূর্বশর্তটিকে বলে **লিঙ্গদর্শন** (রান্নাঘরে ধূম দর্শন। ধূম হল 'লিঙ্গ' বা 'হেতু')। দ্বিতীয় পূর্বশর্তটিকে বলে **লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ জ্ঞান** (ধূম = লিঙ্গ, বহ্নি = লিঙ্গী। ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধজ্ঞান বা **ব্যাপ্তিজ্ঞান**)। এ-দুটি পূর্বশর্তের

ওপর নির্ভর করেই অপ্রত্যক্ষগোচর লিঙ্গীর (বহ্নির) জ্ঞান বা অনুমান হতে পারে। এই দুটি পূর্বশর্তের সংযুক্তিকে বলে 'ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞান' বা **'পরামর্শ'**। এই পরামর্শ-এর পরেই অনুমিতিরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। **'পরামর্শ জন্যং জ্ঞানং অনুমিতি'**। পরামর্শ থেকে উৎপন্ন যে জ্ঞান তাই অনুমিতি।

প্রতিটি অনুমানের তিনটি ধর্মবিশিষ্ট তিনটি পদ (Term) ও অন্তত তিনটি বচন (Proposition) থাকে। তিনটি ধর্ম যথাক্রমে (১) **পক্ষ ধর্ম** (Minor term), (২) **সাধ্য ধর্ম বা লিঙ্গী** (Major term) এবং (৩) **হেতু ধর্ম বা লিঙ্গ** (Middle term)। পাকশালায় (রান্নাঘরে) ধূম দেখে আমরা যখন অনুমান করি যে, সেখানে বহ্নি আছে, তখন সেই অনুমানের আকারটি হয় নিম্নরূপ ঃ

ঐ পাকশালায় বহ্নি আছে,
কেননা, ঐ পাকশালায় ধূম আছে, এবং
যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি।

৮.১৭. পক্ষ, সাধ্য ও হেতুর প্রত্যয় বা ধারণা
(Concept of Paksha, Sadhya and Hetu)

প্রত্যেক অনুমানে তিনটি ধর্ম বিশিষ্ট পদ (Term) এবং অন্তত তিনটি বচন (Proposition) থাকে। তিনটি ধর্ম হচ্ছে— (১) পক্ষ ধর্ম, (২) সাধ্য ধর্ম বা লিঙ্গী ও (৩) হেতুধর্ম বা লিঙ্গ। পাকশালায় ধূম দেখে আমরা যখন অনুমান করি যে সেখানে বহ্নি আছে তখন সেই অনুমানের আকারটি (ত্রি-অবয়বী) হয়—

যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি, যথা—যজ্ঞশালা, গোশালা, ইত্যাদি
পাকশালায় ধূম আচ্ছে
∴ পাকশালায় বহ্নি আছে।

এখানে 'পাকশালা' হচ্ছে পক্ষ ধর্মবিশিষ্ট পদ, 'বহ্নি' সাধ্য ধর্মবিশিষ্ট পদ এবং 'ধূম' হেতু ধর্মবিশিষ্ট পদ। তিনটি ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা গেল ঃ

(১) **পক্ষ ঃ যেখানে সাধ্যের সংশয় থাকে তাকে 'পক্ষ' বলে**। পক্ষের সঙ্গে সাধ্যের সম্বন্ধ স্থাপনই অনুমানের লক্ষ্য। যে পদার্থে সাধ্যের অনুমান করা হয়, তাই পক্ষ। ধূম দর্শন করে পর্বতে বহ্নি অনুমান করার ক্ষেত্রে 'বহ্নি' হচ্ছে সাধ্য আর পর্বত হচ্ছে 'পক্ষ'। অনুমিত বচনের (অনুমিতির) উদ্দেশ্য হচ্ছে পক্ষ আর বিধেয় সাধ্য। পক্ষ হল ধর্মী, আর সাধ্য সেই ধর্মীয় ধর্ম।

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ পক্ষের লক্ষণ প্রকাশ করে বলেছেন, 'সন্দিগ্ধ সাধ্যবান পক্ষ', অর্থাৎ যে পদার্থে সাধ্যের সংশয় থাকে সেই পদার্থ **পক্ষ**। যে পদার্থে সাধ্যধর্ম পূর্বেই নিশ্চিত অর্থাৎ সর্বসম্মত, তাকে বলে **'সপক্ষ'**। যেমন, পর্বতে ধূম দেখে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা সকলেই নিশ্চিত জানি যে পাকশালায় (ধূমের সঙ্গে) বহ্নি থাকে। এখানে 'পাকশালা' সপক্ষ। এজন্যই ন্যায়দর্শনে 'সপক্ষকে' বলা হয়েছে 'নিশ্চিত সাধ্যবান'। তেমনি, যে পদার্থে সাধ্যধর্মের অভাব পূর্বেই নিশ্চিত অর্থাৎ সর্বসম্মত, তাকে বলে **'বিপক্ষ'**। যেমন, পর্বতে ধূম দেখে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা সকলেই নিশ্চিত জানি যে মহাহ্রদে বহ্নির অভাব আছে অর্থাৎ বহ্নি নেই (ধূমও নেই)। এখানে 'মহাহ্রদ' হচ্ছে বিপক্ষ। এজন্য ন্যায়দর্শনে 'বিপক্ষকে' বলা হয়েছে 'নিশ্চিত সাধ্যাভাববান'। কিন্তু

পর্বতে ধূম দেখে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে বহ্নির অধিকরণ যে সপক্ষ 'পর্বত' তা 'পাকশালা' অথবা বিপক্ষ 'মহাহ্রদের' মতো নয়, কেননা এক্ষেত্রে পর্বতে বহ্নির অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় থাকে। এখানে সাধ্যের (বহ্নির) অধিকরণটি (পর্বত) 'সন্দিগ্ধ সাধ্যবান' অর্থাৎ অধিকরণটিতে সাধ্যধর্ম (বহ্নিত্ব) সন্দিগ্ধ। প্রাচীন **নৈয়ায়িকগণ এই প্রকার সন্দিগ্ধ সাধ্যবান পদার্থকেই 'পক্ষ' বলেছেন।** পক্ষতে সাধ্য প্রত্যক্ষ হলে, পক্ষতে সাধ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় না থাকলে, সেই পক্ষতে সাধ্যের উপস্থিতি সম্পর্কে **সাধারণত** অনুমানের প্রয়োজন হয় না। কাজেই, **প্রাচীন মতে,** যে পদার্থে সাধ্যের সংশয় থাকে কেবল সেই পদার্থ হচ্ছে 'পক্ষ'।

নব্য নৈয়ায়িক প্রাচীন মত মানেন না। নব্যেরা বলেন যে, সাধ্যসিদ্ধি অর্থাৎ পক্ষে (পর্বতে) সাধ্যের (বহ্নির) সিদ্ধি বা নিশ্চিত জ্ঞান থাকলেও, **যদি 'সিষাধয়িষা' বা 'অনুমান করার ইচ্ছা' থাকে তাহলেও পক্ষে (পর্বতে) সাধ্যের (বহ্নির) অনুমান সম্ভব হতে পারে। এখানে 'সিদ্ধি' হচ্ছে অনুমানের প্রতিবন্ধক আর 'সিষাধয়িষা' অনুমানের উত্তেজক।** প্রতিবন্ধক (সিদ্ধি) থাক অথবা না থাক, **যদি উত্তেজক (সিষাধয়িষা) থাকে তাহলেও অনুমান সম্ভব হবে। কাজেই, নব্যমতে, যদি কোন অধিকরণে সাধ্যের সংশয় (সিদ্ধির অভাব) থাকে অথবা অনুমানের ইচ্ছা (সিষাধয়িষা) থাকে, অথবা দুটি বৈশিষ্ট্যই থাকে, তাহলে সেই অধিকরণ বা পদার্থকে 'পক্ষ' বলা হবে। নিম্নোক্তভাবে বিষয়টি বোঝান গেল—**

(ক) সিদ্ধি আছে এবং সিষাধয়িষা আছে—অনুমান সম্ভব

(খ) সিদ্ধি আছে কিন্তু সিষাধয়িষা নেই---অনুমান সম্ভব নয়।

(গ) সিদ্ধি নেই কিন্তু সিষাধায়িষা আছে—অনুমান সম্ভব

(ঘ) সিদ্ধি নেই এবং সিষাধয়িষা নেই—অনুমান সম্ভব।

কেবল দ্বিতীয় ক্ষেত্রের (খ) অনুমিতির উদ্দেশ্যটিকে 'পক্ষ' বলা যাবে না, কেননা সেক্ষেত্রে সাধ্যের সংশয় নেই (অর্থাৎ সিদ্ধি আছে), আবার অনুমানের ইচ্ছাও নেই (সিষাধয়িষা নেই)। বাকি তিনটি ক্ষেত্রেই (ক, গ, ও ঘ) অনুমিতির উদ্দেশ্যকে 'পক্ষ' বলা যাবে। ভারতীয় ন্যায়ে যাকে পক্ষ বলা হয়, অ্যারিস্টলের ন্যায়ে তাকে Minor Term বলা হয়।

(২) সাধ্য ধর্ম ঃ

অনুমানের সাহায্যে যা প্রমাণিত হয় তাকেই 'সাধ্য' বলে। ভিন্নভাবে বলা যায়---পক্ষে যা সাধন করা হয় বা প্রমাণ করা হয় তাকেই 'সাধ্য' বলে। সাধ্যকে 'অনুমেয়'ও বলা হয়, কেননা সাধ্যই হচ্ছে অনুমানের বিষয়। ধূম দেখে পর্বতে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে অনুমানের বিষয় (অনুমেয়) হচ্ছে 'বহ্নি'—পক্ষ পর্বতে বহ্নির অনুমান করা হয়। কাজেই এখানে 'বহ্নি' হচ্ছে সাধ্য। অনুমিতিরূপ সিদ্ধান্ত বাক্যের বিধেয়টি সাধারণত সাধ্য-ধর্ম জ্ঞাপক হয়। 'সাধ্য' হচ্ছে 'পক্ষে'র (যা সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য) ধর্ম। পক্ষ হল ধর্মী, 'সাধ্য' তার ধর্ম। পর্বত বহ্নিমান,—এই অনুমিতির ক্ষেত্রে পর্বত হচ্ছে ধর্মী, বহ্নিত্ব যার ধর্ম। কাজেই, অনুমিতির বিধেয় 'বহ্নি' হচ্ছে সাধ্যধর্ম। ভারতীয় ন্যায়ে যাকে 'সাধ্য' বলা হয়, অ্যারিস্টলের ন্যায়ে তাকে Major Term বলা হয়।

(৩) হেতু ধর্ম ঃ

হেতু বা লিঙ্গের মাধ্যমেই সিদ্ধান্তে পক্ষধর্ম ও সাধ্যধর্মের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়। হেতু হল অনুমানের ভিত্তি। 'পর্বতঃ বহ্নিমান, ধূমাৎ'—এই অনুমানে পর্বতে ধূম দেখে বহ্নি অনুমান

করা হয়েছে। এখানে পর্বতে ধূমের প্রত্যক্ষজ্ঞান থাকলেও পর্বতে বহ্নির প্রত্যক্ষজ্ঞান নেই। পর্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করে সেখানে বহ্নি অনুমান করা হয়েছে। এখানে 'ধূম' হচ্ছে হেতু। হেতুকে 'লিঙ্গও' বলা হয়। 'লিঙ্গ' অর্থে 'চিহ্ন'। হেতু-চিহ্ন দেখেই পক্ষে, সাধ্যের অনুমান করা হয়। হেতুকে আবার 'ব্যাপ্য'ও বলা হয় (সাধ্যকে বলা হয় 'ব্যাপক'); কেননা হেতুধর্ম সর্বদা সাধ্যধর্ম দ্বারা ব্যাপ্ত হয় (ঢাকা পড়ে)---হেতুর পরিধি বা ব্যাপকতা সাধারণত সাধ্যের পরিধি অপেক্ষা কম হয়। হেতু না থাকলে অনুমান সম্ভব হয় না। হেতুর সঙ্গে পক্ষের এবং হেতুর সঙ্গে সাধ্যের সম্বন্ধজ্ঞান না থাকলে অনুমান হয় না। উক্ত উদাহরণে হেতু 'ধূমের' সঙ্গে পক্ষ 'পর্বত' ও সাধ্য 'বহ্নি'র সম্বন্ধ আছে। এভাবে, হেতুর মাধ্যমেই সিদ্ধান্তে পক্ষ ও সাধ্যের মধ্যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুমানের হেতুটিকে পূর্বজ্ঞাত (প্রসিদ্ধ) পদার্থ হতে হয়।

অ্যারিস্টটলের ন্যায়ে হেতুধর্মবিশিষ্ট পদকে বলা হয় 'Middle term'। ন্যায় দর্শনে সৎ হেতুর পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যথা---(ক) পক্ষসত্ত্ব, (খ) সপক্ষাসত্ত্ব, (গ) বিপক্ষাসত্ত্ব, (ঘ) অবাধিতত্ত্ব ও (ঙ) অসৎপ্রতিপক্ষত্ব।

(ক) **পক্ষসত্ত্ব ঃ হেতুধর্মের, পক্ষধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়াকে বলে 'পক্ষসত্ত্ব'**। একটি ত্রি-অবয়বী ন্যায়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝান গেল---

পর্বত বহ্নিমান

যেহেতু পর্বত ধূমবান

যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি, যথা--পাকশালা, যজ্ঞশালা গোশালা প্রভৃতি।

এখানে 'ধূম' হচ্ছে হেতু এবং 'পর্বত' পক্ষ। এখানে (দ্বিতীয় বচনে) পর্বতের সঙ্গে ধূমের সম্পর্ক দেখান হয়েছে; কাজেই ধূমে পক্ষসত্ত্ব আছে

(খ) সপক্ষাসত্ত্ব ঃ যে যে পদার্থে সাধ্য (যথা--বহ্নি) উপস্থিত থাকে সেই সেই পদার্থে হেতুর (যথা---ধূমের) নিশ্চিত উপস্থিতি হচ্ছে সপক্ষাসত্ত্ব, অর্থাৎ **সপক্ষে হেতুর উপস্থিত থাকা হচ্ছে সপক্ষাসত্ত্ব**। ধূম দেখে পর্বতে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে পাকশালা, যজ্ঞশালা, গোশালা প্রভৃতি হচ্ছে সপক্ষ, কেননা আমরা নিশ্চিত জানি যে ঐ সব স্থানে বহ্নি থাকে (ধূমও থাকে)। কাজেই পাকশালা প্রভৃতি পক্ষে হেতু ধূমের সপক্ষসত্ত্ব আছে।

(গ) **বিপক্ষাসত্ত্ব ঃ বিপক্ষে হেতুর না থাকা হচ্ছে বিপক্ষাসত্ত্ব**। অনুমানের সাধ্যটি যে-সব স্থানে নেই বলে আমাদের নিশ্চিতজ্ঞান থাকে সেইসব স্থান বা অধিকরণ হচ্ছে বিপক্ষ। ধূম দেখে পর্বতে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত জানি যে সমুদ্রে, হ্রদে, নদীতে বহ্নি থাকে না (ধূমও থাকে না)। কাজেই সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয়ে (বিপক্ষে) হেতু ধূমের বিপক্ষাসত্ত্ব আছে।

(ঘ) **অবাধিতত্ত্ব ঃ** অনুমান ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা হেতুর খণ্ডিত হওয়া হচ্ছে 'বাধিত হওয়া'। আর অন্য **কোন বলশালী প্রমাণের দ্বারা, হেতুর খণ্ডিত না হওয়া হচ্ছে 'অবাধিত হওয়া' বা 'অবাধিতত্ত্ব'**। 'দ্রব্যত্ব' হেতু দর্শন করে বহ্নিতে 'শীতলতা' অনুমিত হলে (যথা- যেখানে দ্রব্যত্ব সেখানেই শীতলতা, বহ্নিতে দ্রব্যত্ব আছে। অতএব বাহ্নিতে শীতলতা আছে।) তা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয়---আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, বহ্নি শীতল নয়, উষ্ণ। এজন্য এখানে 'দ্রব্যত্ব' হেতুটি বাধিত, অর্থাৎ 'বহ্নিতে' হেতু 'দ্রব্য' বাধিত। কিন্তু ধূমকে হেতু ধরে পর্বতে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে ধূম অবাধিত হেতু, কেননা যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি। সৎ হেতুর

অবাধিতত্ত্ব থাকা প্রয়োজন।

(ঙ) **অসৎপ্রতিপক্ষত্ব ঃ কোন প্রতিপক্ষ না থাকাই হচ্ছে 'অসৎ-প্রতিপক্ষ হওয়া'**। যে হেতুর কোন প্রতিপক্ষ থাকে না, তাকে বলে **'অসৎপ্রতিপক্ষ হেতু'**। একই বিষয় সম্বন্ধে যদি দুটি পরস্পর বিরোধী হেতুকে অবলম্বন করে বাদী ও প্রতিবাদী দুটি ভিন্ন সিদ্ধান্ত উপনীত হয়, তাহলে কোন একপক্ষ সিদ্ধান্তকে সুনিশ্চিত বলা যায় না। কাজেই, হেতুর প্রতিপক্ষ সৎ (থাকা) হলে সেই হেতুকে 'সৎ হেতু' বলা যাবে না। হেতুর প্রতিপক্ষ অসৎ হতে হবে, অর্থাৎ হেতুকে 'অসৎপ্রতিপক্ষ' হতে হবে। ধূম দেখে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে হেতু ধূমের কোন প্রতিপক্ষহেতু না থাকায় ঐ হেতুর অসৎপ্রতিপক্ষত্ব আছে, অর্থাৎ হেতুটি সৎ হেতু।

কোন অনুমানের হেতুর এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি থাকলে তবেই তাকে 'সৎ হেতু' বলা যাবে। হেতু সৎ না হলে অনুমান বৈধ হবে না এবং হেত্বাভাষ (fallacy) দেখা দেবে।

৮.১৮. অনুমানের ভিত্তি (Grounds of Inference)

অনুমান দুটি প্রধান শর্তের ওপর নির্ভর করে। এ-দুটি শর্তকে 'অনুমানের ভিত্তি' বলা হয়। শর্ত দুটি হল ঃ

(১) **পক্ষধর্মতাজ্ঞান বা পক্ষে হেতু দর্শন ঃ পক্ষে হেতুর অবস্থানকে 'পক্ষধর্মতা' বলে।** পক্ষটি যে হেতুবান---এমন জ্ঞানকে **'পক্ষধর্মতাজ্ঞান'** বলে। পক্ষধর্মতাজ্ঞান অনুমানের একটি পূর্বশর্ত। 'পর্বতটি ধূমবান; অতএব পর্বতটি বহ্নিমান।'—এই অনুমানে প্রথম বচনটি হচ্ছে পক্ষে (পর্বতে) হেতু (ধূম) দর্শন বা পক্ষধর্মতাজ্ঞান।

(২) **ব্যাপ্তিজ্ঞান ঃ 'ব্যাপ্তি' হচ্ছে হেতু ও সাধ্যের নিয়ত অব্যভিচারী সম্বন্ধজ্ঞান।** পর্বতটি ধূমবান, যেখানেই ধূম সেখানেই বহ্নি; অতএব পর্বতটি বহ্নিমান'—এই অনুমানে ধূম (হেতু) ও বহ্নির (সাধ্যের) সম্বন্ধজ্ঞানই— যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি-এমন জ্ঞানই—ব্যাপ্তিজ্ঞান।

'পর্বতটি ধূমবান' এমন পক্ষধর্মতাজ্ঞান এবং 'যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি'—এমন ব্যাপ্তিজ্ঞান হলে তবেই 'পর্বতটি বহ্নিমান'---এমন অনুমিতি সম্ভব।

(৩) **পরামর্শ ঃ** নৈয়ায়িকগণ অনুমানের আরও একটি শর্তের উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞান পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে হলে অনুমান করা যায় না। পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞান উভয়কে একসঙ্গে যুক্ত করে তবেই অনুমান সম্ভব হয়। এই তৃতীয় শর্তটি হল, **ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান। একে 'পরামর্শও'** বলা হয়। নব্যন্যায় মতে, পরামর্শের জন্য যে জ্ঞান তাই অনুমিতি। **'পরামর্শজন্যং জ্ঞানং অনুমিতি'**। 'পর্বতে বহ্নিব্যাপ্তিবিশিষ্টধূম আছে'—এমন জ্ঞান হল পরামর্শ বা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান।

৮.১৯. পরামর্শ (Parāmarsa) বা লিঙ্গ-পরামর্শ (Linga-parāmarsa)

ন্যায় দর্শনে 'অনুমান' বলতে 'পঞ্চাবয়বী ন্যায়'-কেই বোঝান হয়। ন্যায়মতে 'পরামর্শজন্যং জ্ঞানং অনুমিতি,' অর্থাৎ পরামর্শের জন্য যে জ্ঞান তাই অনুমিতি*। **'পরামর্শ' বলতে বোঝায় 'ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান।'** ত্রি-অবয়বী ন্যায়ে পক্ষধর্মতাজ্ঞান থাকে, ব্যাপ্তিজ্ঞানও থাকে, কিন্তু 'ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান' অর্থাৎ 'পরামর্শ' থাকে না, থাকলেও তাকে বচনে প্রকাশ করা

* অনুমান পদ্ধতির (প্রমাণের) মাধ্যমে লব্ধজ্ঞান 'অনুমিতি'।

হয় না। 'পক্ষধর্মতাজ্ঞান' হল পক্ষে হেতু দর্শন। 'ব্যাপ্তিজ্ঞান' হল সাধ্য ও হেতুর নিয়ত অব্যভিচারী সম্বন্ধের জ্ঞান। 'ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান' হচ্ছে এ-দুটি জ্ঞানের সংযুক্তি অর্থাৎ পক্ষে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর বর্তমানতা সম্পর্কে জ্ঞান। দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝান গেল ঃ

ত্রি-অবয়বী ন্যায়—

যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি (ব্যাপ্তিজ্ঞান)

পর্বতটি ধূমবান (পক্ষধর্মতাজ্ঞান)

অতএব, পর্বতটি বহ্নিমান।

এই ত্রি-অবয়বী ন্যায়ে প্রথম আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং দ্বিতীয় আশ্রয়বাক্যে পক্ষধর্মতাজ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু এ-দুটি আশ্রয়বাক্যের কোন একটি থেকে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হতে পারে না। এ-দুটি আশ্রয়বাক্যকে যুক্ত করে তৃতীয় এক আশ্রয়বাক্য গঠন করলে তবেই সেই আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত নিষ্কাশিত হতে পারে। ত্রি-অবয়বী ন্যায়ে মনে মনে এই সংযুক্তিকরণ হলেও তাকে বচনে প্রকাশ করা হয় না। পঞ্চাবয়বী ন্যায়ে দুটি আশ্রয়বাক্যকে মনে মনে সংযুক্ত করে তাকে ভিন্ন এক বচনের আকারে প্রকাশ করা হয় এবং সেই বচনটিকেই বলা হয় 'পরামর্শ' বা 'লিঙ্গপরামর্শ'। লিঙ্গপরামর্শটি সিদ্ধান্তের ঠিক পূর্বে থাকে বলে তাকেই সিদ্ধান্তের করণরূপে গণ্য করা হয়। যেমন—

পঞ্চাবয়বী ন্যায়—

১। পর্বতটি বহ্নিমান

২। যেহেতু পর্বতটি ধূমবান (পক্ষধর্মতাজ্ঞান)

৩। যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি (ব্যাপ্তিজ্ঞান), যথা—পাকশালা

৪। বহ্নিব্যাপ্য ধূম ঐ পর্বতে আছে (ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান বা পরামর্শ)

৫। অতএব, পর্বতটি বহ্নিমান।

এখানে চতুর্থ বচনটি হচ্ছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বচনের সংযুক্তিকরণ। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, চতুর্থ বচনটিতে অনুমানের পক্ষ, সাধ্য ও হেতু এই তিনটি ধর্মই উপস্থিত আছে। ত্রি-অবয়বী ন্যায়ে কোন আশ্রয়বাক্যেই তিনটি ধর্ম একত্রে থাকে না। এর ফলে ত্রি-অবয়বী ন্যায়ের সিদ্ধান্তে পক্ষধর্ম ও সাধ্যধর্মের মধ্যে সম্বন্ধ পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের চতুর্থ আশ্রয়বাক্যে তিনটি ধর্ম একত্রে উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্তে পক্ষ ও সাধ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা প্রত্যক্ষভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই চতুর্থ বচনটি হচ্ছে 'পরামর্শ' বা 'লিঙ্গপরামর্শ'। এই বাক্যটি শুনে শ্রোতার মনে 'পরামর্শ' উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ সে স্মরণ করে—পর্বতে যে ধূম দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে বহ্নির ব্যাপ্তিযোগ আছে। এই প্রকার স্মরণের ফলে পক্ষে (পর্বতে) সাধ্যের (বহ্নির) উপস্থিতি সম্পর্কে শ্রোতার মনে কোন সংশয় থাকে না এবং সে উপলব্ধি করে (সিদ্ধান্ত করে) যে, 'পর্বতে বহ্নি আছে'। এজন্যই নৈয়ায়িক বলেছেন—'পরামর্শজন্যং জ্ঞানং অনুমিতি'—অর্থাৎ পরামর্শ অনুমিতির করণ—পরামর্শ না হলে অনুমিতি হয় না।

৮.২০. সহচর নিয়মরূপে ব্যাপ্তি (Vyāpti as Sahachara Niyama)

ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির অপরিহার্য শর্ত। ব্যাপ্তিজ্ঞান না হলে অনুমিতি হয় না। হেতু ও সাধ্যের

মধ্যে (ভাষান্তরে, লিঙ্গ ও লিঙ্গীর মধ্যে) নিয়ত সাহচর্য বা সহচর-সম্বন্ধ হল ব্যাপ্তি। সংক্ষেপে, **ব্যাপ্তি হল--- 'হেতু ও সাধ্যের মধ্যে সহচর নিয়ম'**। কথাটির অর্থ বুঝতে হলে 'সহচর' ও 'নিয়ম' শব্দ দুটির অর্থ জানা প্রয়োজন।

'নিয়ম' বলতে বোঝায়, যা নিয়ত বা ব্যতিক্রমহীন। যার ব্যতিক্রম নেই তাই নিয়ম। তাহলে 'সহচর নিয়ম' কথার মানে হল---'ব্যতিক্রমহীন সহচর বা সাহচর্য'। দুটি বিষয়ের সাহচর্য যদি ব্যতিক্রমহীন হয় তবে তারা 'সহচর নিয়মে' আবদ্ধ বুঝতে হবে। ক ও খ-এর সম্পর্ক যদি এমন হয় যে, ক থাকলে খ-ও থাকে, আর খ না থাকলে ক-ও থাকে না, তাহলে তারা 'সহচর নিয়মে' আবদ্ধ হয়।

'সহচর' বলতে **সমানাধিকরণ** বা একাধিকরণ বোঝায়। দুটি বিষয় একই অধিকরণে থাকলে তাদের মধ্যে সহচর সম্বন্ধ আছে বুঝতে হবে। ধূম ও বহ্নির মধ্যে সহচর সম্বন্ধ, কেননা—যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি; আবার যেখানে বহ্নির অভাব সেখানে ধূমেরও অভাব। ধূম ও বহ্নির অধিকরণ একই। পাকশালায়, গোশালায়, চত্বরে, যজ্ঞবেদীতে দেখা যায় ধূম থাকলে বহ্নি থাকে, বহ্নি না থাকলে ধূমও থাকে না।

এ-প্রকার, হেতুর সঙ্গে সাধ্যের সহচর-সম্বন্ধ হল ব্যাপ্তি সম্বন্ধ। পর্বতে ধূম দর্শন করে সেখানে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে ধূম হচ্ছে 'হেতু' আর বহ্নি হচ্ছে 'সাধ্য'। ধূম ও বহ্নির মধ্যে সহচরসম্বন্ধ আছে--ধূম ও বহ্নি একই অধিকরণে থাকে। ধূম ও বহ্নির মধ্যে যে সাহচর্য তা নিয়তও, কেননা যখন এবং যেখানেই ধূম সেখানেই বহ্নি থাকে।

৮.২১. ব্যাপ্তির প্রকৃতি (Nature of Vyāpti)

দুটি পদার্থের মধ্যে নিয়ত অব্যভিচারী সম্বন্ধ হল ব্যাপ্তি। অনুমানের ক্ষেত্রে, হেতু ও সাধ্যের মধ্যে নিয়ত সাহচর্য হল ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ। **ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির প্রধান এবং অসাধারণ কারণ**। 'অসাধারণ' অর্থে যা সকল কার্যের ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে না। মৃত্তিকা মৃন্ময় ঘটের অসাধারণ কারণ, কেননা মৃত্তিকা কেবল মৃন্ময় ঘট সৃজনের ক্ষেত্রেই থাকে, পট (বস্ত্র) বা কাঠের টেবিল সৃজনের ক্ষেত্রে থাকে না। ব্যাপ্তিজ্ঞান কেবল অনুমিতির ক্ষেত্রেই থাকে, প্রত্যক্ষজ্ঞান ইত্যাদির ক্ষেত্রে থাকে না। এজন্য ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির 'অসাধারণ' কারণ।

ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ হচ্ছে 'ব্যাপ্য-ব্যাপক-সম্বন্ধ'। কথাটির অর্থ জানার জন্য 'ব্যাপক' ও 'ব্যাপ্য' শব্দ দুটির মানে জানা প্রয়োজন। যার দ্বারা ব্যাপ্ত হয় (যা ঢাকা দেয়) তাকে 'ব্যাপক' এবং যা ব্যাপ্ত হয় (ঢাকা পড়ে) তাকে 'ব্যাপ্য' বলে। ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ অনৌপাধিক (unconditional), অব্যভিচারী (invariable), আবশ্যিক (necessary) ও নিয়ত সহচর (universal)। এ-সম্বন্ধ শর্তাধীন নয়, উপাধি-নির্ভর নয় এবং এই সম্বন্ধের কোন ব্যতিক্রম নেই।

ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ, কেননা যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি এবং এর কোন বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত নেই। এখানে ধূম 'হেতু' আর বহ্নি 'সাধ্য'; ধূম 'ব্যাপ্য' আর বহ্নি 'ব্যাপক'। বহ্নি ধূমের ব্যাপক আর ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। **সাধারণত যা ব্যাপক তার পরিধি যা ব্যাপ্য তার পরিধি অপেক্ষা বেশি**। বহ্নির পরিধি বা ব্যাপকতা ধূমের পরিধি বা ব্যাপকতা অপেক্ষা বেশি। যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি। কিন্তু এমন বললে ঠিক হবে না, 'যেখানে বহ্নি সেখানেই ধূম'। বহ্নি ধূমকে নিয়ত অনুগমন করলেও ধূম বহ্নিকে নিয়ত অনুগমন করে না। ধূম বহ্নি অপেক্ষা

অল্পস্থান থাকে, তাই ধূম 'ব্যাপ্য' ; বহ্নি ধূম অপেক্ষা অধিক স্থানে থাকে, তাই বহ্নি 'ব্যাপক'। ধূম থাকলেই বহ্নি থাকে, কিন্তু বহ্নি থাকলে সেখানে ধূম না থাকতেও পারে। তপ্ত লৌহখণ্ডে বহ্নি থাকলেও ধূম থাকে না। সুতরাং বহ্নি ধূমের দ্বারা ব্যাপ্ত নয়। ধূম ও বহ্নির ক্ষেত্রে তাই ধূম 'ব্যাপ্য', বহ্নি 'ব্যাপক'। এ-কারণে ধূমকে 'হেতু' করে ও বহ্নিকে 'সাধ্য'রূপে গণ্য করে অনুমান করা চলে, কেননা **ধূম ও বহ্নির মধ্যে নিয়ত সহচরসম্বন্ধ আছে**। কিন্তু বহ্নিকে 'হেতু' ও ধূমকে 'সাধ্য'রূপে গণ্য করে অনুমান করলে তা বৈধ হবে না, কেননা বহ্নি ও ধূমের মধ্যে নিয়ত সাহচর্য নেই। ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ ব্যাপ্তি সম্বন্ধ, কেননা এ সম্বন্ধ অনৌপাধিক অর্থাৎ শর্তহীন; কিন্তু বহ্নি ও ধূমের সম্বন্ধ অনৌপাধিক বা শর্তহীন নয়, এ সম্বন্ধ উপাধিযুক্ত বা শর্তাধীন। ভিজে কাঠযুক্ত বহ্নির সঙ্গেই ধূম থাকে। এখানে 'ভিজে কাঠ' হল উপাধি। সঠিক অর্থে বহ্নি ও ধূমের সম্বন্ধকে 'ব্যাপ্তি' বলা যাবে না।

৮.২২. ব্যাপ্তির প্রকার (Kinds of Vyapti)

ব্যাপ্তি দুপ্রকার—(১) **সমব্যাপ্তি** ও (২) **বিষমব্যাপ্তি বা অসমব্যাপ্তি**। সমব্যাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যাপ্য ও ব্যাপকের ব্যাপকতা সমান হয়, অর্থাৎ ব্যাপ্য ও ব্যাপক উভয়ে সমব্যাপক হয়। ক ও খ দুটি বিষয় তখনই সমব্যাপক হবে যদি এমন হয় যে, যেখানে ক সেখানেই খ এবং যেখানে খ সেখানেই ক। এমন হলে, ক ও খ-এর মধ্যে সমব্যাপ্তি আছে বলতে হবে। সমব্যাপ্তির উদাহরণ হল—'সকল উৎপত্তিশীল বস্তু হয় বিনাশশীল'। এখানে 'উৎপত্তিশীল বস্তু' ও 'বিনাশশীল বস্তু' সমব্যাপক, কেননা—যার উৎপত্তি আছে তার বিনাশ আছে, আবার যার বিনাশ আছে তার উৎপত্তি আছে। কাজেই, এক্ষেত্রে যে কোন একটি থেকে অপরটিকে বৈধভাবে অনুমান করা যায়।

বিষমব্যাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যাপ্য ও ব্যাপকের ব্যাপকতা ভিন্ন হয়। অর্থাৎ, সমব্যাপক নয় এমন দুটি বিষয়ের ব্যাপ্তিকে বিষয়ব্যাপ্তি বলে। বহ্নি ও ধূমের ব্যাপ্তি বিষমব্যাপ্তি। ধূম বহ্নি অপেক্ষা কম স্থানে থাকে আর বহ্নি ধূম অপেক্ষা বেশি স্থানে থাকে। ধূম থাকলে সেখানে বহ্নি থাকে। কিন্তু বহ্নি থাকলে সেখানে ধূম থাকবেই—এমন নয়। ধূম না থাকলেও বহ্নি থাকতে পারে। যেমন, তপ্ত লৌহপিণ্ড। এজন্য, ধূম দেখে বহ্নির অনুমান করা গেলেও বহ্নি দেখে ধূমের অনুমান করলে তা সকল সময়ে বৈধ হয় না।

৮.২৩. ব্যাপ্তিগ্রহ বা ব্যাপ্তি নির্ণয়ের উপায় (ব্যাপ্তি-প্রতিষ্ঠা)
(Vyāptigraha or method of establishing vyāpti)

ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমানের ভিত্তি। দুটি বিষয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ সামান্য বচনের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। প্রশ্ন হল ঃ কিভাবে এই ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ—এই সামান্য বচন প্রতিষ্ঠা করা যায়? ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে জানি যে, যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি? কিভাবে জানি—সকল ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান? ন্যায় মতে, ব্যাপ্তি নির্ণয়ের প্রণালী আছে এবং তা হল **অন্বয়, ব্যতিরেক, ব্যভিচারাগ্রহ, উপাধিনিরাস, তর্ক ও সামান্যলক্ষণ-প্রত্যক্ষ**।

অন্বয় ঃ দুটি বিষয়ের একত্র উপস্থিতি হল অন্বয়। দুটি বিষয়ের অন্বয় বা একত্র উপস্থিতি লক্ষ্য করে জানা যায় যে, সে-দুটি বিষয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ আছে। যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি। পাকশালা (রান্নাঘর), গোশালা, যজ্ঞবেদী প্রভৃতি স্থানে ধূম থাকে, বহ্নিও থাকে। এসব ক্ষেত্রে ধূম ও বহ্নির একত্র উপস্থিতি বা অন্বয় লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়।

ব্যতিরেক ঃ দুটি বিষয়ের একত্র অনুপস্থিতি হল ব্যতিরেক। দুটি বিষয়ের একত্র অনুপস্থিতি বা ব্যতিরেক লক্ষ্য করে জানা যায় যে, সে-দুটি বিষয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে। যেখানে বহ্নি নেই সেখানে ধূমও নেই। নদীতে, হ্রদে, সমুদ্রে বহ্নি নেই, ধূমও নেই। এসব ক্ষেত্রে ধূম ও বহ্নির একত্র অনুপস্থিতি বা ব্যতিরেক-সম্বন্ধ থেকে তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়।

অন্বয় ও ব্যতিরেকের **যুগ্ম-প্রণালীর** মাধ্যমেও ব্যাপ্তি নির্ণয় করা যায়। যেখানে ধূম আছে সেখানে বহ্নি আছে, আর যেখানে বহ্নি নেই সেখানে ধূমও নেই—ধূম ও বহ্নির এমন সম্বন্ধ লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়। এই যুগ্ম-প্রণালী পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানী মিল (Mill) -এর অন্বয়-ব্যতিরেক পদ্ধতির (Joint Method of Agreement and Difference) -সঙ্গে তুলনীয়।

ব্যভিচারাগ্রহ ঃ ব্যভিচার-অগ্রহ দ্বারাও ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। 'ব্যভিচার' বলতে বোঝায় 'বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত', আর 'অগ্রহ' বলতে বোঝায় 'অদর্শন' বা দেখতে না পাওয়া। কাজেই 'ব্যভিচারাগ্রহ' বলতে বোঝায়, 'বিপরীত বা বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তের অভাব।' যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি; ধূম আছে কিন্তু বহ্নি নেই----এমন বিপরীত দৃষ্টান্তের কোন নজির নেই। কাজেই, ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ আছে বলে আমরা জানি।

উপাধিনিরাস ঃ 'উপাধি' বলতে বোঝায় 'শর্ত'। কাজেই 'উপাধিনিরাস' কথার মানে 'শর্ত-নিরাস' বা 'শর্ত-নিরসন'। শর্ত বা উপাধি থাকলে ব্যাপ্তি হয় না। ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য তাই উপাধির নিরাস প্রয়োজন। ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে উপাধি বা শর্তকে নিরসন করতে হবে, অর্থাৎ বাদ দিতে হবে। বহ্নি ও ধূমের সম্বন্ধ শর্তাধীন বা উপাধিযুক্ত। বহ্নি থাকলে সেখানেই ধূম থাকে, সেখানে কাঠ বা ইন্ধন ভিজে। ভিজে কাঠের বহ্নি থেকেই ধূম হয়। যে কাঠ ভিজে নয় তার বহ্নি থেকে ধূম নির্গত হয় না। তপ্ত লৌহপিণ্ডে আর্দ্রতা থাকে না বলে সেখানে বহ্নি থাকলেও ধূম থাকে না। বহ্নি ও ধূমের সম্বন্ধ শর্তযুক্ত বলে তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ আছে বলা যাবে না। কিন্তু ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ উপাধিশূন্য বা নিরুপাধিক বলে তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ আছে।

তর্ক ঃ চার্বাকের মতো সংশয়বাদীরা যদি ব্যাপ্তি সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন, তাহলে তর্কের মাধ্যমে তাঁদের সংশয় দূরীভূত করে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায়। সংশয়বাদীরা এমন বলতে পারেন যে, অন্বয়, ব্যতিরেক, ব্যভিচারাগ্রহ প্রভৃতি প্রণালীর দ্বারা যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় তা যথার্থ নয়, কেননা সেই সম্বন্ধ যে ভবিষ্যতেও সত্য হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এঁদের মতে, ধূম ও বহ্নির মধ্যে যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ তা যে ভবিষ্যতেও থাকবে, এমন নিশ্চয়তা নেই—ভবিষ্যতে বহ্নি ছাড়াই ধূম থাকতে পারে।

সংশয়বাদীদের সংশয় নিরাশের জন্য নৈয়ায়িকগণ 'তর্কের' সাহায্য গ্রহণ করেন। এখানে 'তর্ক' অর্থে **'আরোপ'**—বিপরীত জ্ঞানের আরোপ। কোন প্রমাণের সাহায্যে (যেমন—অনুমান প্রমাণের সাহায্যে) যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সেই সিদ্ধান্তের বিরোধী সিদ্ধান্ত আরোপ করে দেখানো হয় যে ঐ বিরোধী সিদ্ধান্তটি মিথ্যা এবং ফলত মূল সিদ্ধান্তটি সত্য। **অর্থাৎ প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিরোধী সিদ্ধান্ত যে অসম্ভব এটা দেখানোর জন্য যেসব যুক্তি প্রদর্শিত হয়, তাকেই বলে 'তর্ক'**। ব্যাপ্তি-প্রতিষ্ঠায় নৈয়ায়িকগণ এপ্রকার তর্কের (অরোপিত বাক্যের) আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারা বলেন, 'সকল ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান' এই ব্যাপ্তিবাক্যটি সত্য না হলে তার বিরুদ্ধ

বাক্য 'কোন কোন ধূমবান বস্তু নয় বহ্নিমান' (A বচনের বিরুদ্ধ বচন O এবং এই দুটি বিরুদ্ধ বচন একসঙ্গে মিথ্যা হতে পারে না) অবশ্যই সত্য হবে। কিন্তু এমন বলার অর্থ হল 'কারণ ছাড়াই কার্য থাকতে পারে'—একথা স্বীকার করা; কেননা আমরা জানি যে ধূম ও বহ্নির ক্ষেত্রে বহ্নি (সাধ্য) ধূমের (হেতুর) কারণ। যাদের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকে তারা কার্যকারণ ভাবাপন্নই হয়। কিন্তু কারণ ছাড়া কার্য হয় না—এটাই সর্বজনস্বীকৃত। ধূম সৃষ্টি করতে হলে সেখানে বহ্নি সৃষ্টি করতে হয়। ধূমপানের প্রয়োজন হলে বহ্নিসৃষ্টির প্রয়োজন হয়। এভাবে, তর্কের মাধ্যমে নৈয়ায়িকরা হেতু (ধূম) ও সাধ্যের (বহ্নির) মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ প্রতিপাদন করেন।

সামান্যল(ণ-প্রত্য(ঃ নৈয়ায়িকদের মতে, যদিও অন্বয়, ব্যতিরেক, ব্যভিচারাগ্রহ ইত্যাদির দ্বারা ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তর্কের দ্বারা সেই সম্বন্ধ সমর্থিত হয়, তথাপি **একমাত্র সামান্যলক্ষণ-প্রত্যক্ষের মাধ্যমেই ব্যাপ্তিজ্ঞান যথার্থ হতে পারে।** ন্যায় মতে, আমরা যেমন বিশেষ বস্তু প্রত্যক্ষ করি তেমনি ঐ বিশেষে সামান্য ধর্মও প্রত্যক্ষ করি। আমরা যখন বিশেষ স্থানে ধূম ও বহ্নি প্রত্যক্ষ করি তখন সেই ধূম-বিশেষে ধূমত্ব-সামান্য ও বহ্নি-বিশেষে বহ্নিত্ব-সামান্যও প্রত্যক্ষ করি। ধূমত্ব প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সর্বকালের ধূমের ও বহ্নিত্ব প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সর্বকালের বহ্নির অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয় এবং এর ফলে সর্বকালের ধূমের সঙ্গে সর্বকালের বহ্নির সম্বন্ধও প্রত্যক্ষ হয়। এরূপ সর্বকালের ধূম ও বহ্নির অলৌকিক প্রত্যক্ষের ফলেই ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ যথার্থ হয় এবং আমরা একথা নিশ্চিতভাবে বলতে সমর্থ হই যে, 'সকল ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান'।

৮.২৪. অনুমানের শ্রেণীবিভাগ (Classfication of Inference)

স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান ঃ 'অনুমান কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করে'—এই দিক থেকে নৈয়ায়িকগণ অনুমানকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

১। **স্বার্থানুমান** এবং

২। **পরার্থানুমান বা পঞ্চ-অবয়বী অনুমান।**

১। **স্বার্থানুমান ঃ নিজের জ্ঞানলাভের জন্য যে অনুমান, তা স্বার্থানুমান।** অনুমানের বচনকে **'অবয়ব'** বলে। স্বার্থানুমানে তিনটি বচন বা অবয়ব থাকলেই চলে। এই কারণে স্বার্থানুমানকে **'ত্রি-অবয়বী অনুমান'** বলে। তিনটি বচনের মধ্যে দুটি হেতুবাক্য, তৃতীয়টি সিদ্ধান্ত। পর্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করে, ধূমের সঙ্গে বহ্নির ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ স্মরণ করে, কোন ব্যক্তি পর্বতে বহ্নির অনুমান করতে পারে। এরূপ স্বার্থানুমানের আকারটি হল ঃ

পর্বতটি বহ্নিমান,
যেহেতু পর্বতটি ধূমবান এবং
যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি।

২। **পরার্থানুমান ঃ** ন্যায়দর্শনে 'অনুমান' বলতে সাধারণত পরার্থানুমানকেই মনে করা হয়, কেননা পরার্থানুমানের গঠনপ্রণালী রীতিসম্মত। **পরার্থ-অনুমান হল 'অপরের জন্য অনুমান'।** ধূম দেখে বহ্নি অনুমান করার পর যখন কোন ব্যক্তি সেই অনুমানলব্ধ জ্ঞানকে অপরের মনে সঞ্চারিত করতে চান, তখন তা হয় **পরার্থানুমান।** এই প্রকার অনুমানের পাঁচটি বচন বা অবয়ব থাকে বলে একে **'পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়'** বলে। পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ের পাঁচটি অবয়ব হল—

(১) **প্রতিজ্ঞা**, (২) **হেতু**, (৩) **উদাহরণ**, (৪) **উপনয়** এবং (৫) **নিগমন**।

পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ের উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রতিজ্ঞা—পর্বতটি বহ্নিমান

(২) হেতু—যেহেতু পর্বতটি ধূমবান

(৩) উদাহরণ—যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি, যথা—পাকশালা

(৪) উপনয়—বহ্নিব্যাপ্যধূম ঐ পর্বতে আছে

(৫) নিগমন—অতএব পর্বতটি বহ্নিমান।

পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ের পাঁচটি অবয়ব পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়; এরা পরস্পর সংযুক্ত বাক্য। অর্থাৎ পঞ্চ-অবয়বী ন্যায় পাঁচটি অঙ্গবাক্য দ্বারা গঠিত একটি মহাবাক্য। এই পরস্পর সংযুক্ত বাক্যগুলি শুনে শ্রোতা, যার পর্বতে বহ্নি সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না, পর্বতে বহ্নিব্যাপ্য-ধূম আছে জেনে 'পর্বতে বহ্নি আছে',—এমন জ্ঞান লাভ করে। বক্তা পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ের দ্বারা শ্রোতাকে সিদ্ধান্তে 'নীত' করেন। বক্তা নিজে যে সিদ্ধান্ত করেছেন, শ্রোতাকেও পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ের মাধ্যমে সেই সিদ্ধান্তে 'নীত' করেন।

পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ের **প্রথম বাক্যটি প্রতিজ্ঞা**। যা প্রতিপাদন করতে হবে সেটাই প্রতিজ্ঞাবাক্যে ব্যক্ত করা হয়। বক্তার মনে যে জ্ঞানের উদয় হয়েছে, প্রতিজ্ঞাবাক্যে তিনি সেটাই শ্রোতার কাছে উপস্থিত করেন। পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ের লক্ষ্য হল, বক্তার মনে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে শ্রোতার মনে সেই জ্ঞানের উন্মেষ ঘটানো। অনুমানের প্রতিপাদ্য হল, পক্ষের সঙ্গে সাধ্যের সম্বন্ধ নির্দেশ করা। প্রতিজ্ঞাতে বক্তা সেটাই শ্রোতাকে বলেন। যেমন—

'পর্বতটি বহ্নিমান।'

এখানে পর্বত 'পক্ষ' আর বহ্নি 'সাধ্য'।

বক্তার কাছে প্রতিজ্ঞাবাক্যটি প্রমাণিত হলেও শ্রোতার কাছে তা প্রতিষ্ঠিত নয়। এজন্য, প্রতিজ্ঞাবাক্যটি শুনে শ্রোতা প্রশ্ন করতে পারেন---- 'এমন কথা বলার হেতু কি'? এরূপ প্রশ্নের উত্তরদানের জন্যই প্রতিজ্ঞাবাক্যের পর **দ্বিতীয় বাক্য 'হেতুবাক্যে'র উল্লেখ করতে হয়** ঃ

'যেহেতু পর্বতটি ধূমবান'।

বচনটিতে 'পক্ষধর্মতাজ্ঞান' অর্থাৎ পক্ষতে হেতুর (পর্বতে ধূমের) অবস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে, যা অনুমানের অত্যাবশ্যক শর্ত।

কিন্তু 'হেতু'র উল্লেখ করা হলেও শ্রোতার মনে পর্বতের বহ্নি সম্পর্কে সংশয় দূরীভূত না হতেও পারে এবং সে বক্তাকে বলতে পারে—'তাতে কি? ধূম ও বহ্নি তো এক নয়। ধূম দর্শনে তাই বহ্নির জ্ঞান সঠিক নাও হতে পারে।' শ্রোতার এইরূপ সন্দেহ দূরীকরণের জন্যই **তৃতীয় বাক্য 'উদাহরণের'** প্রয়োজন ঃ

'যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি, যেমন—পাকশালা'।

উদাহরণ বাক্যটিই ব্যাপ্তিবাক্য। ধূম থাকলেই যে বহ্নি থাকে, ধূম ও বহ্নির মধ্যে যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ আছে—একথাই উদাহরণ বাক্যে বলা হয় এবং তা বলা হয় একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে, যথা—পাকশালা'।

পঞ্চ-অবয়বী মহাবাক্যের এই তৃতীয় বাক্যটির অর্থাৎ 'উদাহরণের' একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য

আছে। এটি একটি সামান্য বাক্য এবং বাক্যটির কেবল আকারগত সত্যতা নেই, **বস্তুগত সত্যতাও** আছে। বাক্যটির যে বস্তুগত সত্যতা আছে তা দেখান হয় দৃষ্টান্তটির (পাকশালা) মাধ্যমে। উদাহরণ বাক্যটি আসলে একটি আরোহ অনুমানের ফল ঃ পাকশালা, গোশালা, যজ্ঞশালা ইত্যাদি স্থানে ধূম ও বহ্নি একত্র লক্ষ্য করে উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ নির্ণয় করে বলা হয়---'যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি'। তৃতীয় অঙ্গবাক্যটির এই বৈশিষ্ট্য (বস্তুগত সত্যতা) এটাই নির্দেশ করে যে, **পঞ্চ-অবয়বী ন্যায় যুগপৎ অবরোহী ও আরোহী।**

কিন্তু তৃতীয় বাক্য বা 'উদাহরণ' শ্রবণ করেও শ্রোতার মনে পর্বতে বহ্নির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান হয় না; কেননা---'উদাহরণে' যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়েছে তা পাকশালার ধূম ও বহ্নি। পাকশালার ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ থাকতে পারে। কিন্তু পর্বতের ধূম যে পাকশালার ধূমের মতো, পর্বতের বহ্নি যে পাকশালার বহ্নির মতো ---এমন না জানলে পর্বতে ধূম দেখে সেখানে বহ্নির অনুমান করা যায় না। একারণে **চতুর্থ বাক্য অর্থাৎ 'উপনয়ের'** প্রয়োজন হয় ঃ

'বহ্নিব্যাপ-ধূম ঐ পর্বতে আছে।'

অর্থাৎ পর্বতটিতে, পাকশালার ন্যায় বহ্নিব্যাপ্য-ধূম আছে। **এই বাক্যটি ভারতীয় ন্যায়কে এক বিশিষ্টতা দিয়েছে।** পাশ্চাত্য ন্যায়ের সিদ্ধান্তে 'পক্ষ' ও 'সাধ্যের' মধ্যে সম্বন্ধ 'হেতু'র মাধ্যমে দেখান হয়,---পক্ষ ও সাধ্যের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু ভারতীয় পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ে, উপনয়বাক্যে পক্ষ, হেতু ও সাধ্য তিনটিই উপস্থিত থাকে বলে সিদ্ধান্তে পক্ষ ও সাধ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তা **প্রত্যক্ষভাবেই** প্রতিষ্ঠিত হয়। **উপনয় বাক্যটি আসলে 'হেতুবাক্য' ও 'উদাহরণ' বাক্যের মিলিত ফল।**

এই বাক্যটিকে অর্থাৎ উপনয়কে 'লিঙ্গ-পরামর্শও' বলা হয়। এই বাক্যটি শুনে শ্রোতার মনে 'পরামর্শ' উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ সে স্মরণ করে যে, পর্বতে যে ধূম দেখা যায় তার সঙ্গে বহ্নির ব্যাপ্তি-যোগ আছে। এই অবস্থায়, পক্ষে (পর্বতে) সাধ্যের (বহ্নির) অবস্থিতি সম্পর্কে শ্রোতার মনে আর কোন সংশয় থাকে না, এটা উপলব্ধি করে বক্তা **পঞ্চম বাক্য 'নিগমন'** প্রয়োগ করেন ঃ

'অতএব পর্বতটি বহ্নিমান।'

এই বাক্যটি প্রথম বাক্য প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি নয়। প্রতিজ্ঞাবাক্য ও নিগমনবাক্য আকারে এক হলেও তাদের তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতিজ্ঞায় যা ছিল অপ্রমাণিত, নিগমনে তা প্রমাণিতরূপে উপস্থিত। প্রতিজ্ঞা প্রাক্-কল্পনা-স্বরূপ, নিগমন প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান। একারণে নিগমনে **'অতএব'** শব্দটি যুক্ত হয়। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ ও উপনয়---এই চারটি পরস্পর-সংযুক্ত বাক্যের ওপর নির্ভর করে নিগমন বা সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হওয়ায় 'অতএব' শব্দটি যুক্ত হয়। শ্রোতার কাছে এখন আর পর্বতে সাধ্য-ধর্ম (বহ্নি) সম্পর্কে কোন সংশয় থাকে না। শ্রোতার এখন এমন জ্ঞান হয় যে, পক্ষতে সাধ্যধর্ম বর্তমান, অর্থাৎ 'ধূমবান পর্বতটি বহ্নিমান'।

৮.২৫.পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ের সঙ্গে অ্যারিস্টটলের ন্যায়ের তুলনা (Comparison between Five-membered Syllogism and Aristotelian Syllogism)

অ্যারিস্টটলের অবরোহ অনুমানের সঙ্গে পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ের কিছু মিল ও অমিল আছে।

মিল ঃ (১) উভয় প্রকার ন্যায়ের তিনটি ধর্মবিশিষ্ট তিনটি পদ থাকে। যথা—পক্ষ, সাধ্য ও হেতু। (২) উভয় প্রকার ন্যায়েই তিনটি মূল বচন আছে। নৈয়ায়িকদের পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ে পাঁচটি বচন থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সেখানে অ্যারিস্টটলের ন্যায়ের মতো তিনটি মূল বচন আছে। 'নিগমন' বাক্যটি আসলে 'প্রতিজ্ঞাবাক্যের' পুনরাবৃত্তি এবং 'উপনয়' বাক্যটি 'হেতুবাক্য' ও 'উদাহরণের' সমন্বয়।

(৩) উভয় ন্যায়েই ব্যাপ্তিকে অনুমানের ভিত্তিরূপে গণ্য করা হয়।

(৪) উভয় ন্যায়েই একটি বচনকে সার্বিক হতে হয়।

অমিল ঃ (১) ভারতীয় ন্যায় পঞ্চ-অবয়বী, অ্যারিস্টটলের ন্যায় ত্রি-অবয়বী।

(২) পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়েই প্রথম তিনটি বচন (প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ) অ্যারিস্টটলের ন্যায়ের বিপরীত। তেমনি আবার পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ের শেষের তিনটি বচন (উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন) অ্যারিস্টটলের ন্যায়ের অনুরূপ। ভারতীয় পঞ্চ-অবয়বী ন্যায় ও অ্যারিস্টটলের ন্যায় পাশাপাশি রেখে বিষয়টি বোঝা যায়—

অ্যারিস্টটলের ত্রি-অবয়বী ন্যায়	ভারতীয় পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়
(প্রধান হেতু বাক্য) ঃ যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি	প্রতিজ্ঞা ঃ পর্বতটি বহ্নিমান
(অপ্রধান হেতুবাক্য) ঃ পর্বতটি ধূমবান	(হেতু) ঃ (যেহেতু) পর্বতটি ধূমবান
(সিদ্ধান্ত বাক্য) ঃ ∴ পর্বতটি বহ্নিমান	(উদাহরণ) ঃ যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি (যথা—পাকশালা)
	(উপনয়) ঃ পর্বতটি বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান
	(নিগমন) ঃ ∴ পর্বতটি বহ্নিমান

(৩) অ্যারিস্টটলের ন্যায়ে বিভিন্ন মূর্তি (Mood) ও সংস্থান (Figure) আছে। ভারতীয় ন্যায়ে এসবের উল্লেখ নেই।

(৪) অ্যারিস্টটলের ন্যায়ে কেবল আকারগত সত্যতাই বিচার্য। ভারতীয় পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ে আকারগত ও বস্তুগত সত্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

(৫) অ্যারিস্টটলের ন্যায়ে কোন হেতুবাক্যেই পক্ষ ধর্ম ও সাধ্যধর্মের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগ থাকে না। পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ে 'উপনয়' বাক্যটিতে পক্ষ ধর্ম ও সাধ্য ধর্মের সরাসরি সম্বন্ধ দেখানো হয়।

(৬) পঞ্চ-অবয়বী যুক্তি-পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। অ্যারিস্টটলের যুক্তি-পদ্ধতির কেবল তাত্ত্বিক মূল্য আছে, ব্যবহারিক জীবনে তার তেমন প্রয়োগ নেই। অ্যারিস্টটলের যুক্তি-পদ্ধতির পুঁথিগত মূল্য থাকলেও ভারতীয় পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ের মতো তার তেমন ব্যবহারিক মূল্য নেই।

৮.২৬. অনুমানের শ্রেণীবিভাগ—পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট (Classification of Inference—Purvavat, Shesavat and Sāmānyatodrsta)

মহর্ষি গৌতম ভিন্ন এক নিয়ম অনুসারে তিনপ্রকার অনুমানের উল্লেখ করেছেন। যথা—(১) পূর্ববৎ অনুমান, (২) শেষবৎ অনুমান ও (৩) সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। **হেতু ও সাধ্যের মধ্যে যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ তার প্রকৃতি অনুসারে এই শ্রেণীবিভাগ।**

(১) **পূর্ববৎ অনুমান ঃ পূর্ববৎ অনুমানের ভিত্তি হল কার্যকারণমূলক ব্যাপ্তি।** এখানে 'পূর্ব' অর্থে 'কারণকে' বোঝান হয়েছে (কেননা, কারণ কার্যের পূর্বে ঘটে)। 'পূর্বং বিদ্যতে যত্র'—যে অনুমান প্রমাণে কারণ হেতুরূপে বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ **কারণ থেকে কার্যের অনুমান করা হয়, তাকে 'পূর্ববৎ অনুমান' বলে।** এই প্রকার অনুমানে কারণকে প্রত্যক্ষ করে অপ্রত্যক্ষিত কার্যকে অনুমান করা হয়। জ্ঞাত কারণ থেকে অজ্ঞাত কার্যের অনুমান করা হয়। সংক্ষেপে, **'কারণ-হেতুক' অনুমান হচ্ছে পূর্ববৎ অনুমান।** নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য এই প্রকার অনুমানকে 'কারণলিঙ্গক অনুমান'* বলেছেন। যেমন—মেঘ দেখে আসন্ন বৃষ্টির যে অনুমান তা পূর্ববৎ অনুমান।

ভিন্ন ব্যাখ্যা অনুসারে, **পূর্ব-অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে যে অনুমান তা পূর্ববৎ অনুমান।** পূর্বে বিভিন্ন স্থানে যথা—পাকশালা, যজ্ঞশালা, গোশালা প্রভৃতি স্থানে আমরা ধূম ও বহ্নি প্রত্যক্ষ করেছি। এখন দূরের পাহাড়ে ধূম দেখে যদি, পূর্ব-অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে, অনুমান করা হয় যে সেখানে বহ্নি আছে, তাহলে তা হবে পূর্ববৎ অনুমান।

(২) **শেষবৎ অনুমান ঃ শেষবৎ অনুমানের ভিত্তি কার্যকারণমূলক ব্যাপ্তি সম্বন্ধ।** এখানে 'শেষ' অর্থে 'কার্যকে' বোঝান হয়েছে (কেননা, কার্য কারণের শেষে ঘটে)। 'শেষোবিদ্যতে যত্র'— যে অনুমান প্রমাণে কার্য হেতু বা লিঙ্গরূপে বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ **কার্য থেকে কারণের অনুমান করা হয় তাকে 'শেষবৎ অনুমান' বলে।** এই প্রকার অনুমানে কার্যকে প্রত্যক্ষ করে অপ্রত্যক্ষিত কারণের অনুমান করা হয়—জ্ঞাত কার্য থেকে অজ্ঞাত কারণের অনুমান করা হয়। সংক্ষেপে 'কার্য-হেতুক' অনুমান হচ্ছে **শেষবৎ অনুমান।** নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য এই প্রকার অনুমানকে 'কার্যলিঙ্গক অনুমান'** বলেছেন। যেমন—নদীর পূর্ণতা ও স্রোতের প্রখরতা দর্শন করে অতীত বৃষ্টির যে অনুমান তা শেষবৎ অনুমান।

ভিন্ন এক ব্যাখ্যা অনুসারে, **'পরিশেষ' অনুমান হচ্ছে শেষবৎ অনুমান।** 'পরিশেষ' বা 'অবশিষ্ট' পদার্থের অনুমানই শেষবৎ অনুমান। যেমন—

শব্দ—দ্রব্য, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই পাঁচটি ভাব পদার্থের অন্তর্গত নয়। অতএব, শব্দ অবশ্যই (ছয়টি ভাব পদার্থের মধ্যে অবশিষ্ট) গুণ পদার্থের অন্তর্গত।

(৩) **সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান ঃ** কার্যকারণমূলক ব্যাপ্তি সম্বন্ধের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে **এই অনুমান অবাধ প্রত্যক্ষ ও সাদৃশ্যজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল।** নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য এই প্রকার অনুমানকে 'তদন্যলিঙ্গক অনুমান'*** বলেছেন। যে লিঙ্গ বা হেতু অনুমেয় পদার্থের কারণ নয়, কার্যও নয়—এমন লিঙ্গের দ্বারা অনুমিতি হলে সেই অনুমান-প্রমাণের নাম 'তদন্যলিঙ্গক' বা 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমান। যেমন—চাঁদের গতি সম্পর্কে অনুমান। চাঁদের গতি আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না, যদিও বিভিন্ন সময়ে আমরা চাঁদকে বিভিন্ন স্থানে প্রত্যক্ষ করি। অপরাপর পার্থিব বস্তুর ক্ষেত্রে যখন আমরা তাদের স্থান-পরিবর্তন দেখি তখন তাদের গতিও প্রত্যক্ষ করি। এভাবে আমরা জানতে পারি যে, বস্তুর স্থান-পরিবর্তন ও তার গতির মধ্যে এক নিয়ত সহচর-সম্পর্ক (বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধ) আছে। এই প্রকার অবাধ অভিজ্ঞতা ও সাদৃশ্যজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে (চাঁদও

---

* ন্যায়সূত্র-বাৎস্যায়ন ভাষ্য। ফণিভূষণ তর্কবাগীস।

** ন্যায়সূত্র-বাৎস্যায়ন ভাষ্য। ফণিভূষণ তর্কবাগীস।

*** ন্যায়সূত্র-বাৎস্যায়ন ভাষ্য। ফণিভূষণ তর্কবাগীস।

পার্থিব বস্তুর সদৃশ স্থান পরিবর্তন করে, এই জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে) আমরা অনুমান করি ঃ

যা কিছু স্থান-পরিবর্তন করে তা গতিশীল

চাঁদ স্থান-পরিবর্তন করে

অতএব, চাঁদ গতিশীল।

ভিন্ন এক ব্যাখ্যা অনুসারে, অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় যে অনুমান প্রমাণ ব্যবহার করা হয় তা সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। যথা---

গুণ-পদার্থ মাত্রই দ্রব্যে আশ্রিত

ইচ্ছা প্রভৃতি হচ্ছে গুণ পদার্থ

অতএব, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ পদার্থ দ্রব্যে আশ্রিত এবং সেই দ্রব্য হচ্ছে আত্মা।

এভাবে, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের দ্বারা অতীন্দ্রিয় দ্রব্য-আত্মার অস্তিত্বসাধক যে অনুমান-প্রমাণ তা হল সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান।

৮.২৭. অনুমানের শ্রেণীবিভাগ — কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান

(Classification of Inference—Kevalānvayi, Kevalavyatireki and Anvayavyatireki Inferences.)

হেতু বা সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছে--এই প্রশ্নের ভিত্তিতে আবার নব্য ন্যায়ে অনুমানকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে---(১) **কেবলান্বয়ী** অনুমান, (২) **কেবল-ব্যতিরেকী** অনুমান এবং (৩) **অন্বয়-ব্যতিরেকী** অনুমান।

ব্যাপ্তি সম্বন্ধ দুই প্রকার হতে পারে---**অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যোতিরেক ব্যাপ্তি। হেতুর উপস্থিতির সঙ্গে সাধ্যের উপস্থিতির সম্বন্ধ হচ্ছে অন্বয়ব্যাপ্তি।** ধরা যাক, হেতু ধূম ও সাধ্য বহ্নি। এখানে হেতু ধূম ও সাধ্য বহ্নির মধ্যে যে ব্যাপ্তি তা অন্বয়ব্যাপ্তি; কেননা, 'যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে বহ্নিও থাকে, যথা—পাকশালা।'

'ব্যতিরেক' অর্থে 'অভাব'। **সাধ্যের অভাবের সঙ্গে হেতুর অভাবের ব্যাপ্তি হচ্ছে ব্যতিরেকব্যাপ্তি।** সাধ্য বহ্নির অভাবের সঙ্গে হেতু ধূমের অভাবের যে ব্যাপ্তি তা ব্যতিরেকব্যাপ্তি---'যেখানে যেখানে বহ্নি নেই সেখানে ধূমও নেই, যথা---মহাহ্রদ'।

অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি—এই উভয় প্রকার ব্যাপ্তির ওপর নির্ভর করেই নব্য-নৈয়ায়িক উপরোক্ত তিনপ্রকার অনুমানের উল্লেখ করেছেন।

(১) **কেবলান্বয়ী অনুমান ঃ** যে অনুমান কেবলমাত্র অন্বয়ব্যাপ্তি-নির্ভর, তাকে বলে 'কেবলান্বয়ী অনুমান'। কেবলান্বয়ী অনুমানের ব্যাপ্তিবাক্যটির ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, কেবল অন্বয়-দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা---

যা জ্ঞেয় তা অভিধেয় অর্থাৎ নামযুক্ত, যথা--পট (কেবলান্বয়ী-ব্যাপ্তি)

ঘট জ্ঞেয়

∴ ঘট অভিধেয় অর্থাৎ নামযুক্ত।

এখানে অনুমানের ব্যাপ্তিবাক্যটির--'যা জ্ঞেয় তা অভিধেয়' এই বাক্যটির ---কেবলমাত্র অন্বয় দৃষ্টান্তই আছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ প্রভৃতি বস্তু জ্ঞেয় এবং অভিধেয় বা নামযুক্ত। এমন কোন জ্ঞেয় বস্তুর উল্লেখ করা যায় না যার অভিধা অর্থাৎ নাম নেই। কাজেই

ব্যাপ্তিবাকটির কেবল অন্বয় দৃষ্টান্তই আছে, ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত নেই। এপ্রকার, যেসব অনুমানের ব্যাপ্তিবাক্য কেবলমাত্র অন্বয় দৃষ্টান্ত নির্ভর, সে সব কেবলান্বয়ী অনুমান।

(২) **কেবল ব্যতিরেকী অনুমান ঃ যে অনুমান কেবলমাত্র ব্যতিরেক ব্যাপ্তি-নির্ভর তাকে বলে** 'কেবলব্যতিরেকী অনুমান'। কেবলব্যতিরেকী অনুমানের ব্যাপ্তিবাক্যটির অন্বয় দৃষ্টান্ত সম্ভব নয়, কেবল ব্যতিরেকদৃষ্টান্তই সম্ভব। যথা---

যা (ক্ষিতি ভিন্ন) অন্য ভূত থেকে ভিন্ন নয় তা গন্ধযুক্ত নয়, যথা---জল (কেবলব্যতিরেকী ব্যাপ্তি)।

ক্ষিতি গন্ধযুক্ত

∴ ক্ষিতি অন্য ভূত থেকে ভিন্ন।

এখানে কেবল ব্যতিরেক ব্যাপ্তিই সম্ভব অর্থাৎ ক্ষিতি ভিন্ন অন্যান্য ভূতের সঙ্গে (জল বায়ু, তেজ ইত্যাদির সঙ্গে) গন্ধের নিষেধমূলক সম্পর্কই সম্ভব, অন্বয়ব্যাপ্তি সম্ভব নয়। 'যা গন্ধযুক্ত তা ক্ষিতি ভিন্ন অন্যভূত'---এমন অন্বয়ব্যাপ্তি সম্ভব নয়, কেননা ক্ষিতিই একমাত্র গন্ধযুক্তভূত। লক্ষণীয় যে, কেবলব্যতিরেকী অনুমানে একটি হেতুবাক্য (ব্যাপ্তি বাক্যটি) নঞর্থক হওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত সদর্থক হয়েছে, যা পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রসম্মত নয়। পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে একটি হেতুবাক্য নঞর্থক হলে সিদ্ধান্ত অবশ্যই নঞর্থক হবে। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, ক্ষেত্র বিশেষ নঞর্থক হেতুবাক্য থেকেও বৈধভাবে সদর্থক সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হতে পারে। পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্ ও দার্শনিক ব্রাড্‌লি অবশ্য ন্যায় মতকে সমর্থন করে বলেছেন, নঞর্থক উপাত্ত থেকেও কখনো কখনো সদর্থক সিদ্ধান্ত বৈধভাবে নিঃসৃত হতে পারে।

(৩) **অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান ঃ যে অনুমান অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি নির্ভর তাকে বলে 'অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান'**। এই প্রকার অনুমানের ব্যাপ্তিবাক্যটির যেমন অন্বয় দৃষ্টান্ত থাকে, তেমনি ব্যতিরেক দৃষ্টান্তও থাকে। ধূম ও বহ্নির অন্বয়ব্যাপ্তি এবং বহ্নির অভাব ও ধূমের অভাবের ব্যতিরেক ব্যাপ্তির সাহায্যে 'পর্বত বহ্নিমান' এমন অনুমিতির মূলে হচ্ছে অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান প্রমাণ। একটি অন্বয়ব্যাপ্তি ও অন্য একটি ব্যতিরেক ব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝান গেল--

(১) **অন্বয়ব্যাপ্তি**	(২) **ব্যতিকেরব্যাপ্তি**
যা ধূমবান তাই বহ্নিমান,	যা বহ্নির অভাববিশিষ্ট তাই ধূমের অভাববিশিষ্ট,
যথা---পাকশালা	যথা-মহাহ্রদ
পর্বত ধূমবান	পর্বত ধূমবান
∴ পর্বত বহ্নিমান	∴ পর্বত বহ্নিমান

উপরোক্ত দুটি অনুমান যুগ্মভাবে অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানের দৃষ্টান্ত।

৮.২৮. হেত্বাভাস (Fallacy)

যা 'হেতুবদ-অভাসন্তে' অর্থাৎ যা হেতু নয় কিন্তু হেতুর মতো মনে হয়, তাকে 'হেত্বাভাস' বলা হয়। যে সব পদার্থ হেতু নয় কিন্তু হেতুর সঙ্গে সাদৃশ্যবশত 'হেতু' বলে ভ্রম হয়, 'হেত্বাভাস' বলতে এমন **দুষ্ট হেতুকেই** বোঝায়। অনুমান-প্রমাণের বৈধতা হেতুনির্ভর। কাজেই, হেতু দুষ্ট হলে অনুমানও অবৈধ হয়।

ন্যায়দর্শনে ব্যভিচার ইত্যাদি **'হেতুর দোষকেও হেত্বাভাস'** বলা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে, হেতুর সমস্ত লক্ষণ না থাকার জন্য তা প্রকৃত হেতু হতে পারে না। এই প্রকার 'হেতুর দোষ ও হেত্বাভাস। অবশ্য, 'হেত্বাভাস' কথাটি 'দুষ্ট হেতু' ও 'হেতুর দোষ' এই দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও, অর্থ দুটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় কোন অনিষ্ট হয়নি। একটি হেতুর কোন 'দোষ' থাকার অর্থই হচ্ছে 'হেতুটি দুষ্ট' হেতু। কাজেই, এই দুটি ভিন্ন অর্থকে যুক্ত করে বলা হয়— **'যা প্রকৃত হেতু নয় অথচ হেতুর মতো প্রতীয়মান হয় তাই হেত্বাভাস'**।

হেত্বাভাস হচ্ছে অনুমানের বস্তুগত দোষ বা **বাস্তব অনুপপত্তি** (material fallacy)। পাশ্চাত্য ন্যায়ে 'অনুমানের দোষ' বলতে সাধারণত বোঝায় 'আকারগত দোষ বা অনুপপত্তি' (formal fallacy); কিন্তু ভারতীয় ন্যায়ে অনুমানের আকারগত বৈধতা আবশ্যিক। আকারের দিক থেকে সব অনুমানকেই বৈধ হতে হবে, দোষ ঘটলে তা হবে বস্তুগত অর্থাৎ বাস্তব অনুপপত্তি।

ন্যায়মতে হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার। যথা--(১) **সব্যভিচার** বা অনৈকান্তিক, (২) **বিরুদ্ধ**, (৩) **সৎপ্রতিপক্ষ** বা প্রকরণসম, (৪) **অসিদ্ধ** বা সাধ্যসম এবং (৫) **বাধিত** বা কালাতীত।

(১) **সব্যভিচার বা অনৈকান্তিক হেত্বাভাস ঃ**

'সব্যভিচার' অর্থে 'ব্যভিচারেণ সহ বর্ত্ততে,' অর্থাৎ কোন এক পক্ষে থাকার নিয়মের অভাব। যে হেতু কোন এক পক্ষে অব্যভিচারীরূপে থাকে না, উভয় পক্ষে ব্যভিচারীরূপে বিদ্যমান থাকে, তা 'সব্যভিচার হেত্বাভাস' বা' অনৈকান্তিক হেত্বাভাস'। অনৈকান্তিক' অর্থেও বোঝায় 'কোন একপক্ষে থাকার নিয়মের (অব্যভিচারীরূপে থাকার) অভাব'। কাজেই 'সব্যভিচার' ও 'অনৈকান্তিক' শব্দ দুটি সমার্থক।

অনুমানের নিয়ম হচ্ছে, হেতু সাধ্যের দ্বারা ব্যাপ্ত হবে, অর্থাৎ যেখানে হেতু থাকবে সেখানে সাধ্যও থাকবে। যেমন, 'যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি'। এই নিয়ম লঙঘন করলে সব্যভিচার বা অনৈকান্তিক দোষ ঘটে। যথা—

যা বহ্নিমান তা ধূমবান, যথা---পাকশালা

পর্বত বহ্নিমান

∴ পর্বত ধূমবান।

এখানে 'সব্যভিচার' হেত্বাভাস ঘটেছে, কেননা হেতু 'বহ্নি' কেবল একপক্ষ ধূমযুক্ত স্থানেই থাকে না, ধূমযুক্ত নয় এমন অন্যপক্ষেও থাকে, যেমন---তপ্তলৌহপিণ্ড। তপ্তলৌহপিণ্ডে বহ্নি থাকলেও ধূম থাকে না। এখানে হেতু 'বহ্নি' সব্যভিচার বা ব্যভিচারযুক্ত। হেতু 'বহ্নি' সাধ্য 'ধূমের' উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি উভয় পক্ষের সঙ্গেই সম্বন্ধযুক্ত।

সব্যভিচার হেতু আবার তিন প্রকার হতে পারে। যথা---(ক) **সাধারণ**, (খ) **অসাধারণ** ও (গ) **অনুপসংহারী**।

(ক) **যে হেতুর ব্যাপকতা সাধ্যের ব্যাপকতা অপেক্ষা বেশি হয় তাকে 'সাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাস' বলে**। সাধারণ হেতু যেমন সপক্ষে থাকে তেমনি বিপক্ষেও থাকে, যেমন সাধ্যের সহচররূপে থাকে তেমনি সাধ্যাভাবের সহচররূপেও থাকে, অর্থাৎ কোন একপক্ষে না থেকে উভয় পক্ষে থাকে। উপরোক্ত উদাহরণটি 'সাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাসের' উদাহরণ।

(খ) **যে হেতু সপক্ষে থাকে না, বিপক্ষেও থাকে না, কেবল পক্ষেই থাকে, তাকে 'অসাধারণ**

সব্যভিচার হেত্বাভাস' বলে। 'সপক্ষ' হচ্ছে সেইসব পদার্থ যেখানে সাধ্য নিশ্চিতভাবে থাকে ; 'বিপক্ষ' হচ্ছে সেই সব পদার্থ সেখানে সাধ্যের অভাব নিশ্চিতভাবে থাকে; আর 'পক্ষ' হচ্ছে সেই পদার্থ যেখানে সাধ্য আছে বলে মনে করা হয় অর্থাৎ যেখানে সাধ্য প্রমাণের বিষয়। **এই প্রকার হেত্বাভাসে হেতুর ব্যাপকতা এতই কম হয় যে, হেতু কেবল পক্ষতেই এক বিশেষ ধর্মরূপে থাকে।** যেমন —

যেখানে শব্দত্ব সেখানে নিত্যত্ব
শব্দে শব্দত্ব আছে
∴ শব্দে নিত্যত্ব আছে।

এখানে হেতুটি দোষদুষ্ট। হেতু 'শব্দত্ব' কেবল পক্ষ 'শব্দেই' আছে—সপক্ষ নিত্যবস্তু আকাশ, আত্মা, পরমাণু, দিক্, কাল প্রভৃতিতে 'শব্দত্ব' থাকে না, আবার বিপক্ষ অনিত্যবস্তু ঘট, পট, বৃক্ষ প্রভৃতিতেও 'শব্দত্ব' থাকে না। কাজেই 'যেখানে শব্দত্ব সেখানে নিত্যত্ব' এই ব্যাপ্তিবাক্যটি যথার্থ নয়। এখানে হেতু 'শব্দত্ব' ও সাধ্য 'নিত্যত্বের' মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নেই।

(গ) **যে হেতুর অন্বয় এবং ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত থাকে না তা 'অনুপসংহারী হেত্বাভাস'। এক্ষেত্রে হেতু এতই ব্যাপক হয় যে, 'সপক্ষ', 'বিপক্ষ' সবই 'পক্ষে'র অন্তর্ভুক্ত হয়।** কাজেই সপক্ষ বা বিপক্ষ কোনরূপ দৃষ্টান্তের মাধ্যমেই হেতুটিকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। যেমন—

যা কিছু জ্ঞেয় তাই অনিত্য
সববস্তুই জ্ঞেয়
∴ সববস্তুই অনিত্য।

এখানে পক্ষ 'সববস্তু' হওয়ায় সপক্ষ বা বিপক্ষ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায় না। কাজেই কোনরূপ দৃষ্টান্তদ্বারা হেতুটিকে (জ্ঞেয়) প্রমাণ করা যায় না বলে হেতুটি দোষদুষ্ট।

(২) **বিরুদ্ধ হেত্বাভাস ঃ যে হেতু স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী, তাকে বলে 'বিরুদ্ধ হেত্বাভাস'।** হেতুর কাজ হল সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করা; কিন্তু এক্ষেত্রে হেতুটি সাধ্যের বিরোধী হওয়ায়, **হেতুর দ্বারা সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণিত না হয়ে সাধ্যাভাবই প্রমাণিত হয়।** যেমন—

যা কিছু উৎপত্তিশীল, তাই নিত্য
শব্দ উৎপত্তিশীল
∴ শব্দ নিত্য।

এখানে হেতু 'উৎপত্তিশীল' দোষদুষ্ট, কেননা তা সর্বদা অনিত্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, নিত্যবস্তুর সঙ্গে নয়। কাজেই হেতুটি সাধ্য 'নিত্যতাকে' সিদ্ধ না করে তার বিরুদ্ধ 'অনিত্যতাকে'ই সিদ্ধ করে। অনুমানের হেতুটি সাধ্যের নিয়ত সহচর হওয়ায় পরিবর্তে সাধ্যাভাবের নিয়ত সহচর হয়েছে। এজন্য হেতুটি 'বিরুদ্ধ'। বিরুদ্ধ হেত্বাভাস প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিরোধী সিদ্ধান্তই প্রমাণ করে। **বিরুদ্ধ হেতুর কোন সপক্ষ থাকে না, কিন্তু বিপক্ষ দৃষ্টান্ত থাকে।**

'সব্যভিচার হেতুর' সঙ্গে 'বিরুদ্ধ হেতুর' পার্থক্য হল—সব্যভিচার হেতু প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, আর বিরুদ্ধ হেতু প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে।

(৩) **সৎপ্রতিপক্ষ বা প্রকরণসম হেত্বাভাস ঃ**

'সৎ' অর্থে 'থাকা' আর 'প্রতিপক্ষ' অর্থে 'বিরোধী'। 'সৎপ্রতিপক্ষ হেতু' অর্থে 'বিরোধী

হেতুর বিদ্যামান থাকা'। **নিজপক্ষের হেতু এবং প্রতিপক্ষের হেতু যদি সমান বলশালী হয় তাহলে 'সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস' ঘটে।** এখানে নিজপক্ষের হেতুর দ্বারা যে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, প্রতিপক্ষের হেতুর দ্বারা সেই সাধ্যের অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এরূপক্ষেত্রে, নিজপক্ষের অনুমান প্রতিপক্ষের অনুমানের সৎপ্রতিপক্ষ এবং দুটি অনুমানেরই প্রতিপক্ষ থাকায় কোন একটি সিদ্ধান্তকেও নির্দোষরূপে গ্রহণ করা যায় না।

সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসকে 'প্রকরণসম হেত্বাভাস'ও বলা হয়। 'প্রকরণ' বলতে বোঝায়, বাদী ও প্রতিবাদীর প্রতিপাদ্য বিষয়'। **বাদী ও প্রতিবাদীর নিজ নিজ হেতু যদি তাদের সিদ্ধান্তকে সামনভাবে প্রমাণ করে, তাহলে 'প্রকরণসম' হেত্বাভাস হয়।** এক্ষেত্রে কোন একপক্ষের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা যায় না, কারণ অন্যপক্ষের সিদ্ধান্ত সমান বলশালী, কাজেই মানতে হয় যে, এরূপক্ষেত্রে উভয়পক্ষের হেতুই দোষদুষ্ট এবং হেতু দুষ্ট হওয়ায় কোন পক্ষের হেতুই প্রস্তাবিত সাধ্যকে সিদ্ধ করতে পারে না। যেমন--

বাদীপক্ষ (মীমাংসক) বলেন,

যা কিছু শ্রুতিগোচর তা নিত্য, যথা--শব্দত্ব

শব্দ শ্রুতিগোচর

∴ শব্দ নিত্য।

প্রতিবাদীপক্ষ (নৈয়ায়িক) বলেন,

যা কিছু উৎপত্তিশীল তা অনিত্য, যথা--ঘট

শব্দ উৎপত্তিশীল

∴ শব্দ অনিত্য।

বাদীপক্ষের হেতু 'শ্রুতিগোচর' শব্দের নিত্যতা প্রতিপাদন করে; প্রতিবাদীপক্ষের হেতু 'উৎপত্তিশীল' শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদন করে। কাজেই এক্ষেত্রে 'সৎপ্রতিপক্ষ' বা 'প্রকরণসম' হেত্বাভাস হয়েছে।

'বিরুদ্ধ হেতুর' সঙ্গে 'সৎপ্রতিপক্ষ হেতু'র পার্থক্য হল---বিরুদ্ধ হেত্বাভাসের ক্ষেত্রে হেতু কেবল একটি মাত্র থাকে, কিন্তু সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসের ক্ষেত্রে দুটি হেতু থাকে। 'বিরুদ্ধ হেতু' নিজেই সাধ্যাভাব প্রমাণ করে, কিন্তু 'সৎপ্রতিপক্ষ হেতু'র ক্ষেত্রে একপক্ষের হেতু সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, আর অন্যপক্ষের হেতু সাধ্যাভাব প্রমাণ করে।

(৪) **অসিদ্ধ বা সাধ্যসম হেত্বাভাস ঃ**

যে অনুমানে হেতুতে সাধ্যধর্মের উপস্থিতি সিদ্ধ না হয়ে কল্পিত হয়, তাকে 'অসিদ্ধ' বা 'সাধ্যসম হেত্বাভাস' বলে। এপ্রকার হেতু ও সাধ্যের **কল্পিত ব্যাপ্তির** ওপর নির্ভর করে বৈধ অনুমান সম্ভব নয়। হেতু সিদ্ধ হবে অর্থাৎ প্রমাণিত হবে, সাধ্যের মতো অসিদ্ধ হবে না। সাধ্যকে সাধন অর্থাৎ প্রমাণ করার জন্যই হেতু প্রদর্শিত হয়। **হেতু যদি সাধ্যের মতো (= সম) অসিদ্ধ হয় তাহলে সেই দুষ্ট হেতুকেই বলে 'অসিদ্ধ' বা 'সাধ্যসম'। অর্থাৎ যে অনুমানের হেতু সাধ্যের সম (মতন) অসিদ্ধ তাকে 'অসিদ্ধ হেত্বাভাস' বা 'সাধ্যসম হেত্বাভাস' বলে।** যেমন---

যে সব বিষয় অরবিন্দত্বযুক্ত সেসব বিষয় সুগন্ধযুক্ত, যথা---সরোজারবিন্দ

গগনারবিন্দ অরবিন্দত্বযুক্ত

∴ গগনারবিন্দ সুগন্ধযুক্ত

এখানে হেতু 'অরবিন্দত্ব' অসিদ্ধ বা অপ্রমাণিত, যেহেতু 'গগনারবিন্দ' অপ্রমাণিত বা কল্পিত হওয়ায় তাকে 'অরবিন্দত্বযুক্ত' বলা যাবে না। এক্ষেত্রে হেতু 'অরবিন্দত্ব' পক্ষ 'গগনারবিন্দে' আশ্রিত না হওয়ায় হেতুটি দুষ্ট হয়েছে। এই প্রকার, হেতু যে পক্ষে আশ্রিত, সেই পক্ষ যদি কল্পিত হয় তাহলে 'অসিদ্ধ' বা 'সাধ্যসম হেত্বাভাস' হয়।

অসিদ্ধ হেত্বাভাস তিনপ্রকার—(ক) **আশ্রয়াসিদ্ধ** (খ) **স্বরূপাসিদ্ধ** ও (গ) **ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ**।

(ক) **আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস ঃ যদি হেতুর আশ্রয় পক্ষের অস্তিত্ব না থাকে, অর্থাৎ পক্ষ যদি কল্পিত হয়, তাহলে সেই হেতুকে বলে 'আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস'**। উপরোক্ত উদাহরণটি আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাসের উদাহরণ।

(খ) **স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস ঃ যে হেতুর অভাব পক্ষে থাকে, অর্থাৎ যে হেতু কখনো পক্ষে অবস্থান করে না, সেই হেতুকে বলে 'স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস'**। আশ্রয়াসিদ্ধ হেতুর ক্ষেত্রে পক্ষটি কল্পিত হয়; কিন্তু এখানে অর্থাৎ স্বরূপাসিদ্ধ হেতুর ক্ষেত্রে পক্ষটি কল্পিত বা অলীক নয়। তবে এক্ষেত্রেও, হেতুটি পক্ষে অবস্থান করে না। সৎ হেতু পক্ষে আশ্রিত থাকে। সৎ হেতুর এই বৈশিষ্ট্যকে বলে 'পক্ষধর্মতা'। যেখানে পক্ষধর্মতা থাকে না সেখানে স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়। যেমন—

যে সব পদার্থ চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তা গুণ পদার্থ, যথা—রূপ
শব্দ চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য
∴ শব্দ গুণপদার্থ।

এখানে হেতু 'চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব' পক্ষ 'শব্দে' আশ্রিত নয়। এখানে পক্ষে হেতুর অভাব আছে। চক্ষু রূপের গুণত্ব প্রমাণ করতে পারলেও শব্দের গুণত্ব প্রমাণ করতে পারে না। শব্দসংবেদন কর্ণেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে হয়, চক্ষুরিন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে হয় না। 'শব্দের গুণত্ব' প্রমাণে হেতু 'চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব' স্বরূপত অসিদ্ধ।

(গ) **ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস ঃ যে হেতুর সঙ্গে সাধ্যের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকে না, যেখানে হেতুর সঙ্গে সাধ্যের সম্পর্ক অনৌপাধিক বা নিঃশর্ত নয়, তাকে 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস' বলে**। সোপাধিক বা উপাধিযুক্ত হেতুই হচ্ছে এই প্রকার। যেমন—

যা বহ্নিমান তা ধূমবান, যথা—পাকশালা
পর্বত বহ্নিমান
∴ পর্বত ধূমবান।

এখানে বহ্নির সঙ্গে ধূমের ব্যাপ্তি উপাধি-নির্ভর এবং উপাধিটি হল আর্দ্র-ইন্ধন বা ভিজে কাঠ। ভিজে কাঠে বহ্নি সংযোগ করলে তবেই ধূম উৎপন্ন হয়।

(৫) **বাধিত বা কালাতীত হেত্বাভাস ঃ**

যখন অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা পক্ষে সাধ্যাভাব প্রমাণ করা যায় তখন সেই অনুমানে ব্যবহৃত হেতুকে বলে 'বাধিত হেত্বাভাস'। অন্যভাবে বলা যায়—কোন অনুমানের সিদ্ধান্ত যদি অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা ভ্রান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ঐ অনুমানে ব্যবহৃত হেতুটি হবে 'বাধিত হেত্বাভাস'। যেমন—

সকল দ্রব্য হয় শীতল, যথা—ঘট
বহ্নি দ্রব্য
বহ্নি শীতল।

এখানে হেতু 'দ্রব্যত্বের' দ্বারা পক্ষ 'বহ্নিতে' 'শীতলতা' ধর্ম প্রতিপাদন করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু **প্রত্যক্ষ প্রমাণে** বহ্নির উষ্ণতাধর্মই প্রমাণিত। কাজেই 'বহ্নিতে শীতলতা' ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহৃত হেতু 'দ্রব্যত্বে' এখানে 'বাধিত হেত্বাভাস' পরিস্ফুট হয়েছে।

বাধিত হেত্বাভাসকে 'কালাতীত'ও বলা হয়। অনুমেয়ধর্ম সম্পর্কে যতক্ষণ সংশয় থাকে ততক্ষণ, অর্থাৎ সংশয় নিরশন না হওয়া-কাল পর্যন্ত, অনুমানের প্রয়োজন। বলশালী কোন প্রমাণের দ্বারা যখন সেই অনুমেয়ধর্মটির অভাব প্রমাণিত হয়, তখন আর অনুমানের প্রয়োজন হয় না। এরূপক্ষেত্রে দুষ্ট হেতুটির প্রয়োজন একটি বিশেষ কাল পর্যন্ত (বলশালী প্রমাণের প্রয়োগকাল পর্যন্ত) থাকে বলে এই প্রকার হেত্বাভাসকে 'কালাতীত' বলে।

সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস ও বাধিত হেত্বাভাসের মধ্যে পার্থক্য হল—সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসে একটি অনুমানের হেতু (বাদীপক্ষের) অপর একটি অনুমানের হেতুকে (প্রতিবাদীপক্ষের) খণ্ডিত করে অথবা ঐ **হেতুর দ্বারা খণ্ডিত** হয়; কিন্তু বাধিত হেত্বাভাসে অনুমান একটি থাকে এবং সেই অনুমানের হেতু অন্য কোন **প্রমাণের দ্বারা খণ্ডিত** হয়।